হসিনা

টগবগ টগবগ করে ঘোড়া ছুটে চলেছে। কুমারের গোলাপী মসলিনের পাগড়ির পুচ্ছ দুলে দুলে উঠছে হসিনার ছোটার তালে তালে। কুমারের পিছনে বসা দুখিরামের গলায় ও বাজুতে বাঁধা মাদুলি তাবিজও দুলে চলেছে সমানে। পাংশুমুখে দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে বসে রয়েছে দুখিরাম দু'হাতে কুমারের কোমর জড়িয়ে ধরে। তার নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে উঠছে যেন, সমস্ত শরীর গোলাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে সে। অবশ্য ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হওয়া কোনও নতুন ব্যাপার নয় দুখিরামের কাছে। গত আটমাস ধরে ক্রমাগত এরকম হয়ে হয়ে ক্রমশ এটা তার প্রায় স্বভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। তবে আজকের ব্যাপারটা আরও অনেক বেশী মারাত্মক, আরও ভয়াবহ ----।

আজ ঠিক আটমাস হল কাঁঠালিপুরের জমিদার বাড়িতে এসেছে দুখিরাম। কুমার শার্দূল সিং-এর পার্শ্বচর হয়ে। তার আগে অবধি আজীবন কেটেছে সাসারামে। মামাবাড়িতে। তাকে পেটে নিয়ে মা তার বিধবা হয়ে সাসারামে এসেছিল ভায়েদের আশ্রয়ে। জন্ম অবধি সাসারাম ছাড়া অন্য কোন শহর গ্রাম লোকালয় দেখেনি দুখিরাম। আর সে জন্যে কোন দুঃখও ছিল না মনে তার। মামাবাড়িতে অতি আবদারে অতি যত্নে না হলেও মোটামুটি ভালই ছিল সে, দুখিনি মায়ের আঁচল ঘিরে। কিন্তু তার কপালে সেটুকু নিরাপত্তাও লেখেননি বিধাতা।

জন্মাবধিই রোগা ডিগ্‌ডিগে হাড্ডিসার শরীর। তার উপর ক্রমাগত নিয়ম ধরে যত রাজ্যের শক্ত শক্ত অসুখে পড়ে একেবারেই এখন তখন অবস্থা হত যখন তখন। মা একে ওকে তাকে ধরে নানারকম কবচ মাদুলি ঝাড়ফুঁক করালেন। মামারা ডাকযোগে কোষ্ঠিবিচার করালেন বেনারসের সেরা জ্যোতিষী দিয়ে। কোষ্ঠিবিচারে সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে দুখিরামের আয়ুই নেই মোটে। নিত্য নতুন

অসুখ বিসুখ এগুলো সবই অজুহাত। এইভাবে টুক করে একদিন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যাবে সে। দুখিরামের মা কোষ্ঠিফল শুনে তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মামাদেরও মন খারাপ হয়ে গেল। আবার নতুন করে জ্যোতিষীর সঙ্গে পত্রালাপ করা হ'ল। এবার সামান্য একটু আশার রেশ দিলেন জ্যোতিষী। বললেন একটা উপায় আছে। দুখিরামের মায়ের পুত্রনাশ আসন্ন হলেও দুখিরামকে যদি কোনরকমে শমন আসার আগেই কোথাও পাচার করে দেওয়া যায় তবে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। যমদূত যদি ঠিকানা খুঁজে না পায় তবে রক্ষা পেয়ে যাবে দুখিরাম। তবে ভারি চুপিসারে সরাতে হবে তাকে।

দুখিরামের বড় মামা, যিনি উকিল, কোন এক মামলায় কাঁঠালিপুরের জমিদারকে ভারি বেকায়দা থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং সেই থেকে সরযূ সিং বাঁধা মক্কেল তাঁর।

দুখিরামের ব্যাপারটা কানে যেতেই অভয় দিয়ে বললেন, "বকীল সাহাব, কোন চিন্তা নাই। আপনার ভাগনেকে আমি দেখভাল্ করবো। যম কেন, তার বাপেরও সাধ্যি নেই ওর গায়ে আঁচ লাগায়।"

দুখিরামের নিরুপায় মামারা ওঁর কথায় রাজী হল। এমনিতেও বাঁচানো যাবে না যখন, শেষ চেষ্টা হিসেবে সরযূ সিং-এর হেফাজতেই দিয়ে দেখা যাক ছেলেটাকে। যমদূতকে গুলিয়ে দিতে এর থেকে ভাল জায়গা আর কোথায় !

সরযূ সিং সাসারাম থেকে দুখিরামকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি এসে শার্দূল সিং-এর হাতে সঁপে দিলেন তাকে। ভাবলেন প্রায় সমবয়সী দু'জনে সহচরের মত সাথে সাথে থাকবে। দুখিরামের মত সুবোধ নিরীহ ছেলের সঙ্গ ভাল বই মন্দ করবে না তার। স্নেহান্ধ সরযূ সিং ছেলের স্বরূপ জানতেন না ভালমত। জানলে বুঝতেন যে বাঘের বাচ্চাকে ছাগল গরুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে তাকে অহিংস বানানো যায় না। বাঘের বাচ্চা বাঘের বাচ্চাই থাকে, যদ্দিন না সে পুরোপুরি বাঘ হয় ----।

কাঁঠালিপুরে এসে বাঘের গুহায় বাঁধা ছাগলের মতই অবস্থা হল দুখিরামের। দুখিরাম ভাবে, হায়রে! যমের ভয়ে মা মামারা তাকে ধরে বেঁধে যমালয়েই পাঠিয়ে দিল আগে ভাগে। এর চেয়ে মায়ের চোখের

সামনে বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে মরা যে অনেক ভাল ছিল তার। সত্যিই কুমারের অত্যাচারের শেষ নেই। মদ, সিগারেট ছাড়াও আরও নানারকম বিলাস ব্যসন ব্যভিচারে আসক্ত সে। দুখিরামের দম বন্ধ হয়ে আসে সেই পাপ পরিবেশে। কিন্তু কুমারের শাস্তির ভয়ে নির্বাক সাক্ষী গোপালের মত অহর্নিশি পাশে পাশে কাছে কাছে থাকতে হয় তাকে, ঘৃণা অরুচির কন্ঠ রোধ করে।

জমিদারের ঠাট-বাট-আয় পড়ে এলেও এখনও জমি আছে প্রচুর। অর্ধজীর্ণ প্রাসাদ ঘিরে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মাঠ-ঘাট-ক্ষেত-খামার। মান্ধাতার আমলের পুরোনো পদ্ধতিতে এখনও সে ক্ষেতে কাজ করে চলেছে অর্ধভুক্ত রোগক্লিষ্ট মানুষগুলো। দেশ স্বাধীন হলেও সে স্বাধীনতার বার্তা সর্বত্র পৌঁছয়নি আজও। কাঁঠালিপুরের জমিদারের চাকর বাকর জনমজুরদের হাত পা এখনও বাঁধা রয়েছে দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের শৃঙ্খলে।

জমিদার বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবল। বিরাট আস্তাবল। প্রায় পনেরো বিশটা ঘোড়ার থাকার মত জায়গা সেখানে। এক কালে থাকতোও পনেরো বিশটা ঘোড়া। এখন সারা আস্তাবলটা নিয়ে থাকে শুধু হসিনা। বাড়ির বুড়ো চাকর মগনলাল দেখাশোনা করে তার। আসলে মগনলাল সহিসই। বংশানুক্রমে জমিদার বাড়িতে সহিসের কাজ করে এসেছে মগনলালের বাপ ঠাকুর্দারা। এখন নেহাত আস্তাবলের কাজ কম আর গাঁয়ের লোকজনেরা অনেকে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ায় জমিদার বাড়ি কাজকর্মের লোকের অভাব। তাই মগনলালের উপর হসিনার সেবাযত্নের সঙ্গে হসিনার মালিকদের সেবাযত্নের ভারও এসে গেছে খানিকটা।

সরযূ সিং পারতপক্ষে ঘোড়ায় চড়েন না। একখানা পুরোনো ঝরঝরে অস্টিন আছে। আস্তাবলের পাশে গ্যারাজে রাখা থাকে সেটা। গ্রামের রাস্তাঘাট গাড়ি চালানোর অনুকূল নয় ! তবে শহরে মামলা মোকদ্দমা, কাজে কর্মে প্রায়ই যেতে হয় তাঁকে। অস্টিনে চেপেই যাতায়াত করেন। হসিনার পিঠে চড়ার প্রয়োজন কালেভদ্রে ঘটে তাঁর। হসিনা পুরোপুরি কুমার শার্দূল সিং-এর বাহন বলতে গেল। তারই একচেটিয়ে সম্পত্তি প্রায়। দিনে রাতে যখন খুসি শার্দূল সিং এসে হাজির হত আস্তাবলে। মগনলাল হসিনার লাগাম ধরে বাইরে বার করতো। শার্দূল সিং এক

লাফে হসিনার পিঠে চড়ে বসতো। ইঙ্গিতমাত্র হসিনা বাতাসের গতিতে ছুটে চলতো চালকের ঈপ্সীত গন্তব্য পানে।

ইদানীং দুখিরামও সঙ্গে থাকে কুমারের। গতির সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর জাপটে ধরে বসে থাকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম স্মরণ করে। মাঠ ঘাট ক্ষেত খামার পার হয়ে ছুটে চলে হসিনা। অনেক দূরে এসে মালিকপুত্রের পরশের ইঙ্গিতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। হসিনাকে চরতে দিয়ে, দুখিরামকে পাহারায় রেখে কুমার শার্দূল সিং প্রথম সায়াহ্নের নরম আলো আঁধারী ঘেরা নির্জন বৃক্ষচ্ছায়ে অভিসারে রত হয়। লজ্জানত কুমারী কিশোরীর লজ্জা নিয়ে রক্তিম অরুণ দিগন্ত সায়রে ডুব দেয়। অন্ধকারে লীন হয়ে যায় ক্রুর শিকারীর চঙ্গুলবদ্ধ বনহরিণীর নিষ্ফল আকুতি। সাক্ষীগোপালের মত অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে দুখিরাম। আর হসিনা। কুমারের নিত্য নতুন রঙীন অভিসারের মূক সাক্ষী হয়ে। দুখিরামের ভাল লাগে না এসব। মনে মনে ভারী কষ্ট হয় তার।

সরযূ সিং কুমারের সান্ধ্য লীলাখেলার আভাস পেয়েছিলেন। জমিদারের রক্ত ধমনীতে তাঁর ছেলেরও। কাজেই অযথা বিচলিত হননি এ ব্যাপার নিয়ে। তবে ছেলের কীর্তি কলাপ গুণ বাইরে ছড়াক এ তিনি চাননি। বিশেষতঃ সম্প্রতি কুমারের জন্যে খুব ভাল একটা সম্বন্ধ এসেছে এবং প্রায় পাকা হতে চলেছে সেটা। পাটনার নামজাদা উকিল রামায়ণ সিং-এর কন্যা এবং তাঁর সকল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে।

কাঁঠালিপুরের জমিদারের হাঁকডাক যতই থাক ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরে গেছে জমিদারিতে। পুরোনো ঝরঝরে প্রাসাদ আর ধূ ধূ মাঠ ঘাট আর ধুকড়ি পরা ক'ঘর প্রজা। জমিজিরেৎ যা আছে তা থেকে আয় হয় সামান্যই। শুধু জমি থাকলেই হয় না, তাতে উত্তম বীজ, সার ঢালতে হয়। ট্রাক্টর না থাকুক অন্ত তেজালো বলদ লাগিয়ে চষতে হয়। পর্যাপ্ত জলের জন্যে টিউবওয়েল থেকে জল তোলার জন্যে চাই পাম্প। ফসল উঠলে তা ভাল দামে বেচার জন্যেও আবার লোকবল অর্থবল থাকা চাই। যেদিকে তাকাও প্রয়োজন টাকার আর সেই টাকারই বড় অভাব কাঁঠালিপুরের জমিদারের। সে অভাব মেটাতে পারে রামায়ণ সিং-এর

মেয়ে - শার্দূল সিং-এর বধূরূপে এ বাড়িতে পদার্পণ করে। কাজেই সরযূ সিং ছেলের দোষগুণ রেখে ঢেকে সামলে বুঝে চলতে চান অন্তত বিয়েটা হয়ে যাওয়া তক্। কুমারকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন একথা। কুমার শার্দূল সিং-ও ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝে। রামায়ণবাবুর জামাই হয়ে তাঁর এত বছর ধরে একত্র করা কাঁচা টাকায় হাত বসাতে মোটেই অসাধ নেই তার। বরং উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে সেই শুভ ঘটিকার। আর ঠিক এমন সময়েই দুর্যোগটা ঘটলো তার কপালে ----।

মগনলালের মেয়ে নির্মলা। বাপের সঙ্গে ছেলেবেলায় রোজদিন আসতো জমিদার বাড়িতে। ছুটকো ফাইফরমাস খাটতো, হসিনার আদর যত্ন করতো। ইদানীং বড়-সড় হবার পর আর আসে না। কবে কি ভাবে কখন কুমারের আবার নজর পড়লো তার উপর সে কথা জানে না দুখিরাম। হয়তো ঘাটে জল আনতে যাবার পথে কিংবা বনে জ্বালানি কাঠ কিংবা ফলমূল কুড়োতে গিয়ে কুমারের সামনে পড়েছিল। এরপর প্রভুপুত্রকে আর এড়াতে পারেনি। তার সান্ধ্য মৃগয়ার শিকার হয়েছে বহুদিন ধরে।

পাংশু মুখে ডাগর দুটি চোখে নিঃসীম আতঙ্ক নিয়ে সেদিন কুমারের যাবার পথে দাঁড়িয়েছিল নির্মলা।

কুমার শার্দূল সিং অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে যেতে করুণ সুরে মিনতি করেছিল, "কুমার! কুমার! একটু দাঁড়াও। কিছু বলতে চাই তোমাকে।"

কুমার শুনতে চায়নি। নির্মলার পাংশু মুখ আর আতঙ্কে ভরা ডাগর চোখের ভাষাই বলে দিয়েছে কথাটা কি। তাই হসিনার পিঠে চাপড় দিয়ে গতি বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছে তাকে। কিন্তু হসিনা কুমারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে পড়লো। মাথা হেলিয়ে মুক সম্ভাষণ জানালো নির্মলাকে। নির্মলার দু'চোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত জলের ধারা নেমে এলো।

আকুতি ভরা কন্ঠে বললো, "কুমার আমি যে মরতে বসেছি। আমি কি করবো বলে দাও। আমাকে দয়া করো।"

হসিনার পিঠে পা ঝুলিয়ে বসেছিল শার্দূল সিং। নির্মলা তার পা চেপে ধরে কাঁদতে লাগলো। অধৈর্য কুমার ঘোড়া ছুটিয়ে দেবার অনেক

চেষ্টা করলো কিন্তু হসিনা অচল অটল। মাথা নুইয়ে নির্মলার গায়ে মাথা বুলিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে হসিনা। শার্দূল সিং-এর মুখ চোখ নিষ্ফল ক্রোধে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো।

এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে বিকৃত কন্ঠে বললো, "কি, বলতে চাও কি?" নির্মলা কিছু বলার আগেই তাকে বাধা দিয়ে আবার বললো, "না, এখানে নয়। ওদিকে চলো।"

একটু দূরে একটা বড় ডোবা মতন। চারিপাশে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে ডোবাটা। কর্কশ হাতে নির্মলার একটা হাত ধরে সেদিকে টেনে নিয়ে গেল তাকে। খানিকক্ষণ চুপচাপ। ডোবার জলে ছলাৎ করে আওয়াজ হল কি? এত দূর থেকে ঠিক ঠাহর পেলো না দুখিরাম। হসিনা ঘাড় উঁচু করে নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে তীক্ষ্নসুরে ঘোটকীয় নিনাদ করে উঠলো। আবার। আবার।

বেশ কিছু পরে শার্দূল সিং ফিরে এলো। এসেই এক লাফে হসিনার পিঠে চড়ে কোঁকে খোঁচা দিল জুতা পরা পায়ে। বাতাসের বেগে ছুট দিল হসিনা। দুখিরাম কোনমতে টাল সামলে কুমারকে কষে চেপে ধরলো। আধো অন্ধকারে কুমারের চেহারা ভাল করে দেখতে পায়নি। পিছন থেকে ভাল করে দেখাও যায় না। তবু কি যেন অনুভব করলো দুখিরাম। তার ভীষণ ভয় করতে লাগলো। এত ভয় আগে কখনো পায়নি সে, জমিদার বাড়িতে থাকার আটমাস কালে।

রাত ভোর হতেই লোক ছুটলো পাশের গাঁ থেকে গো-বদ্যি আনতে। সারাটা রাত হসিনা আস্তাবলময় দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ভুষির বালতি উলটিয়ে ছিটিয়ে, আস্তাবলের চালার এক অংশ চিবিয়ে একাকার করে রেখেছে। কেউ কাছে এগুতে পারছে না তার। মানুষজন দেখলেই দু'পা তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে হসিনা বিকট একটা আওয়াজ ছাড়ছে।

গো-বদ্যি এলো। দূর থেকে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে লক্ষণ মিলিয়ে দেখে বললো হসিনার নাকি মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। শেয়াল কুকুরের মত ঘোড়াও নাকি পাগল হয়, তবে এরকমটা কদাচিৎ ঘটে। এক্ষেত্রে ঘোড়াটাকে বিষমাখা ভুষি খাইয়ে মেরে ফেলাই সমীচীন। সরযূ সিং রাজী হ'লেন না সে ব্যবস্থায়। হসিনা কাঁঠালিপুরের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের শেষতম

টিমটিমে প্রদীপ। ছেলের বিয়ের আর বেশীদিন বাকি নেই। ওই হসিনার পিঠে চেপেই বিয়ে করতে যাবে সে। হুট করে আর একখানা নতুন আনকোরা ঘোড়া কেনার মত ট্যাঁকের অবস্থা নয় কাঁঠালিপুরের জমিদারের।

বদ্যি বললো, "চিকিৎসা বড় সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া সে চিকিৎসা যে কতটা ফল দেবে কিংবা আদৌ ফল দেবে কিনা সে বিষয়ে কোন পাকা কথা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসাকালে হসিনাকে খুব সাবধানে আটক রাখতে হবে। পাগলা ঘোড়া পাগলা কুকুরের চেয়েও সাংঘাতিক, নরভক্ষী বাঘের সামিল এ ঘোড়া এখন। তক্ষুনি কামারশালা থেকে কামার এলো। আস্তাবলের দরজা মেরামত করে হুড়কো তুলে দেওয়া হল বাইরে থেকে।

একটা বিপদ কাটতে না কাটতে আর একটা এসে উপস্থিত হল। হসিনার হঠাৎ অসুখে রাতভোর ব্যস্ত মগনলাল রাতে আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। একমাত্র মগনলালকেই কাছে ঘেষতে দিচ্ছে হসিনা। ওষুধ খাওয়ানো, সেঁক মালিশ সব কিছু একা হাতে সে-ই করছে। হসিনা থেকে থেকে মগনলালের সারা গায়ে মাথা ঘষছে। রক্তবর্ণ দু'চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে তার।

এমন সময়, রাত তখনো কাবার হয়নি, হঠাৎ হৈ চৈ কাঁদাকাটি করতে করতে জন পনেরো কুড়ি লোক এসে জমিদার বাড়ির ফটকে সোরগোল তুললো। সবাই বাইরে এলো। সরযূ সিং, শার্দূল সিং, চাকর বাকরেরা। দুখিরামও দরজায় এসে দাঁড়ালো। লোকগুলো একটা খাটিয়া বয়ে এনেছে। সরযূ সিং-এর পায়ের কাছে খাটিয়া নামিয়ে রেখে উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিলো। নির্মলার মৃতদেহ।

"গলাটিপে মেরেছে হুজুর। ডোবার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে মেরে ----।"

দুখিরাম দরজা থেকে সরে ঘরের মধ্যে চলে এলো। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। খুন। খুন হয়েছে নির্মলা। এ খুনের সাক্ষী শুধু সে আর হসিনা । কিন্তু হসিনা তো মানুষ নয়। খুনীর নাম চাউড় করে দিতে পারে না সে। পারে শুধু দুখিরাম।

মগনলাল আস্তাবলে হসিনার দেখাশোনা করছিল। খবরটা কানে আসতেই পাগলের মত ছুটে এসে দড়াম করে পড়ে গেল মরা মেয়েটার শবের উপর।

"ওরে জল আন, পাখা আন। কে আছিস কোবরেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে আয় !" ইত্যাকার হাঁকডাক পরে গেল চারিদিকে।

অন্ধকার ঘরে এক কোণে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল দুখিরাম। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন ঢুকলো সে ঘরে। শার্দূল সিং। দুখিরাম পলকে অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এ ঘর সে ঘর পেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে এসে পৌঁছলো।

পিছন থেকে চাপা হিসহিসে গলায় শার্দূল সিং বলছে, "পালাসনে দুখিরাম, একটু দাঁড়া। দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে ----।"

সামনে আস্তাবলের দরজাটা আড়াআড়ি ভাবে ঠেকানো। মগনলাল হুড়কো তুলে দিতে ভুলে গেছে। বেচারার এসব কথা ভাবার মত মনের অবস্থা ছিল না অতবড় দুঃসংবাদটা শোনার পর। দুখিরাম একটু ইতস্তত করছিল। শার্দূল সিং ততক্ষণে কাছে এসে গেছে।

এক লাফে ওর সামনে এসে সাঁড়াশির মত দুটো হাত দুখিরামের গলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, "শা - শালা।"

দুখিরামের সব দ্বিধা সংশয় ঘুচে গেল মুহূর্তে। হসিনার ভয়ও। মরীয়া মানুষের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা ঠেলে আস্তাবলে ঢুকে পড়লো সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।

শার্দূল সিং ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর, "কঁহা ভাগেগা, চুহা কাঁহিকা ----।"

দুহাতে ওর গলা চেপে ধরলো শার্দূল সিং। দুখিরামের মাথা ঝিম ঝিম করছে। চোখের সামনে যেন হলদে লাল নানা রঙের ফুলঝুরি জ্বালিয়েছে কেউ। ক্রমে অন্ধকার নেমে আসে ---- মা, মাগো ----।

দুখিরামের নিভে আসা চেতনার ঘোর খানখান করে দিয়ে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ কানে আসে তার। খুব কাছেই। আবার। আরও একবার। কন্ঠের বেড় আলগা হয়ে গেছে। দুখিরামের নিঃসাড় দেহে সাড়

ফিরে আসে ক্রমে। ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে দুখিরাম। তারপর ভয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে সমুখের বীভৎস বিভীষিকার পানে। কালভৈরবীর ভয়ঙ্করী রূপ হসিনার। দু'চোখ দিয়ে কোন অপার্থিব আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। ওর পায়ের কাছে শার্দূল সিং-এর দেহটা লুটোপুটি খাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে দেহ ----।

সরযূ সিং-এর পৈত্রিক বন্দুক ছিল। তাই দিয়ে নিজে হাতে গুলি করে মারলেন হসিনাকে। খানিক আগে কবিরাজ মশাইকে ডেকে এনেছে লোক গিয়ে। মগনলালের চিকিৎসার জন্যে। দুখিরামের চিকিৎসারও ভার নিলেন তিনি। শার্দূল সিং তখন কবিরাজের আওতার বাইরে। খুব ধুমধাম করে শার্দূল সিং-এর শেষকৃত্য সমাধা হল। সব কিছু চুকে গেলে সরযূ সিং দুখিরামের বড় মামাকে চিঠি দিলেন। মামা এসে দুখিরামকে নিয়ে গেলেন।

দুখিরাম মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "মা, আর আমি কোথাও যাবো না।"

মা তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললেন, "আর তোকে কোথাও যেতে হবে না রে ! ক'দিন আগে তোর মামারা নতুন করে তোর কুষ্ঠি যাচাই করিয়েছে। জ্যোতিষী বলেছে তোর সব ফাঁড়া কেটে গেছে। আর ভয় নেই।"